

মানব পাচার: স্বপ্ন নয়, মৃত্যুর ফাঁদ

মো. মোকাম্মেল হোসেন

শ্রাবণের আকাশজুড়ে ঘন মেঘের আনাগোনা বুড়িগঞ্জার বুকে টিপিটিপি করে বরষা জল। নদীর ঘাটের কাঠের বেঞ্চে একা বসে আছেন প্রবীণ ছমির উদ্দিন। বৃষ্টির ফোঁটা আর চোখের জল একাকার হয়ে তার শীর্ণ গাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে নদীর কালচে জলে।

চার বছর আগের এমনই এক শ্রাবণের রাতে তার ষোল বছরের ছেলে রফিক বাবার হাত শক্ত করে ধরে বলেছিল, “বাবা, আর কটা দিন কষ্ট করো। দালাল কাকা বলেছে, সমুদ্র পেরোলেই কাজ, ভালো বেতন। আমাদের আর অভাব থাকবে না। ছোটো বোনটার পড়াশোনা চলবে, তোমার চিকিৎসাও করাতে পারব।”

সন্তানের চোখে ঐক্য সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় ছমির উদ্দিন ভিটেমাটির শেষ সম্বল বন্ধক রেখে সব টাকা তুলে দিয়েছিলেন পরিচিত সেই দালালের হাতে। অন্ধকার রাতে কাঠের ট্রলারে চেপে রফিক পাড়ি দিয়েছিল অজানা গন্তব্যে। কিন্তু স্বপ্নের দেশে নয়, সে পৌঁছেছিল ভূমধ্যসাগরের কোনো এক বন্দিশালায়, যেখানে প্রতিদিন অপেক্ষা করত নির্যাতন, ক্ষুধা আর মৃত্যুভয়। এরপর মাঝরাতে মোবাইল ফোনে ভেসে আসত ছেলের কান্না। ওপাশ থেকে শোনা যেত হমকি—“টাকা দে, নয়তো ছেলের লাশ পাবি।” সন্তানকে বাঁচাতে ছমির উদ্দিন সুদে টাকা ধার করেছেন, আত্মীয়স্বজনের কাছে হাত পেতেছেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ছয় মাস পর রফিক ফিরেছিল একটি কাঠের কফিনে। কফিন খুলে তিনি দেখেছিলেন নির্যাতনের অসংখ্য ক্ষতচিহ্নে ভরা সন্তানের নিখর দেহ।

এরপর মাঝরাতে মোবাইল ফোনে ভেসে আসত ছেলের কান্না। ওপাশ থেকে শোনা যেত হমকি—“টাকা দে, নয়তো ছেলের লাশ পাবি।” সন্তানকে বাঁচাতে ছমির উদ্দিন সুদে টাকা ধার করেছেন, আত্মীয়স্বজনের কাছে হাত পেতেছেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ছয় মাস পর রফিক ফিরেছিল একটি কাঠের কফিনে। কফিন খুলে তিনি দেখেছিলেন নির্যাতনের অসংখ্য ক্ষতচিহ্নে ভরা সন্তানের নিখর দেহ।

রফিক কেবল একজন মানুষের নাম নয়; সে উন্নত জীবনের আশায় প্রতারণার শিকার হওয়া হাজারো তরুণের প্রতীক। তার গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানব পাচার শুধু একটি অপরাধ নয়—এটি অসংখ্য পরিবারের স্বপ্ন, সম্মান ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেওয়া এক নির্মম বাস্তবতা। দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অনিশ্চয়তা মানুষকে সহজেই ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। সেই সুযোগই নেয় সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র। মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপে মোটা বেতনের চাকরি, সহজে ভিসা, কম খরচে বিদেশ যাত্রা কিংবা আকর্ষণীয় কর্মসংস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর ফাঁদে ঠেলে দেয়।

দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অনিশ্চয়তা মানুষকে সহজেই ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। সেই সুযোগই নেয় সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র। মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপে মোটা বেতনের চাকরি, সহজে ভিসা, কম খরচে বিদেশ যাত্রা কিংবা আকর্ষণীয় কর্মসংস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর ফাঁদে ঠেলে দেয়।

বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগেও মানব পাচার থেমে নেই; বরং আরও কৌশলী হয়েছে। একসময় এই চক্র সীমান্ত, নদীপথ বা গোপন আস্তানাকে ব্যবহার করলেও এখন তাদের বড়ো অস্ত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভুয়া ট্রাভেল এজেন্সি, নকল চাকরির ওয়েবসাইট এবং চটকদার অনলাইন বিজ্ঞাপন। “পাসপোর্ট ছাড়াই ইউরোপ”, “সাত দিনে ভিসা”, “নিশ্চিত চাকরি”—এমন লোভনীয় প্রচারণার আড়ালে লুকিয়ে থাকে আধুনিক দাসত্বের ভয়ংকর জাল।

প্রতিদিন সংবাদপত্রে আমরা পড়ি—ভূমধ্যসাগরে ট্রলারডুবিতে বাংলাদেশির মৃত্যু, সীমান্তে পাচারের শিকার নারী উদ্ধার কিংবা বিদেশে নির্যাতনের খবর। কিন্তু এসব সংবাদে যে সংখ্যাগুলো দেখি, সেগুলো কেবল পরিসংখ্যান নয়। প্রতিটি সংখ্যার পেছনে থাকে একটি পরিবার, একটি ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন, এক মায়ের অশ্রু আর এক বাবার দীর্ঘশ্বাস।

যশোরের এক সীমান্তঘেঁষা গ্রামের রহিমা বেগমের কথাই ধরা যাক। চার বছর আগে ভালো বেতনের গৃহকর্মীর চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর একমাত্র মেয়ে নূপুরকে পাশের দেশে নিয়ে যায় পরিচিত এক নারী। অভাবের সংসারে সন্তি ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেছিল নূপুর। কিন্তু সীমান্ত পেরোনোর পর তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয় একটি পতিতালয়ে। আজও রহিমা বেগম প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘরের দরজা খুলে রাখেন। একটি ছোট প্রদীপ জ্বালিয়ে অপেক্ষা করেন—হয়তো কোনোদিন মেয়েটি ফিরে আসবে। চোখ মুছতে মুছতে তিনি বলেন, “আমার নূপুর তো কোনো অপরাধ করেনি। শুধু আমার অভাবটা মেটাতে চেয়েছিল।” একজন মায়ের এই অপেক্ষা শুধু একটি পরিবারের বেদনা নয়; এটি মানব পাচারের নির্মমতার প্রতিচ্ছবি।

মানব পাচার শুধু একজন মানুষকে শোষণের শিকার করে না; এটি একটি পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। দালালের হাতে সর্বস্ব হারিয়ে অনেক পরিবার ঋণের বোঝা নিয়ে পথে বসে। যারা ফিরে আসেন, তাঁদের অনেকেই বয়ে বেড়ান শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের গভীর ক্ষত। কেউ অঙ্গ হারান, কেউ হারান স্বাভাবিক জীবনযাপনের সক্ষমতা। ভয়, অপমান ও ট্রমা তাদের দীর্ঘদিন তাড়িয়ে বেড়ায়।

বর্তমানে মানব পাচার শুধু সীমান্ত পেরিয়ে মানুষ নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জোরপূর্বক শ্রম, যৌন শোষণ, গৃহদাসত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, সাইবার প্রতারণার মাধ্যমে বিদেশে পাচার এবং অঙ্গ পাচারের মতো অপরাধও এর ভয়াবহ রূপ। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাচারকারীরা ভুয়া পরিচয়, জাল কাগজপত্র এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে আরও সংগঠিতভাবে তাদের অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে এই অন্ধকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো শক্তি হতে পারে সচেতনতা। বিদেশে যাওয়ার আগে অবশ্যই সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে চাকরি, ভিসা, কর্মচুক্তি ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য যাচাই করতে হবে। অচেনা ব্যক্তি বা অনলাইনের লোভনীয় বিজ্ঞাপনের ওপর অন্ধ বিশ্বাস করা কখনোই নিরাপদ নয়।

পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম ও সামাজিক সংগঠন—সবাইকে মানব পাচার প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ, দ্রুত বিচার, সীমান্ত ও সাইবার জগতে কার্যকর নজরদারি এবং পাচারের শিকার ব্যক্তিদের উদ্ধার ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই না, যেখানে কোনো বাবা সন্তানের কফিন বুকে জড়িয়ে কান্না করবেন, কিংবা কোনো মা বছরের পর বছর সন্তানের ফেরার অপেক্ষায় দরজা খোলা রাখবেন। আমরা চাই এমন একটি দেশ, যেখানে জীবিকার সন্ধান মানুষকে মৃত্যুর ফাঁদে ঠেলে দেবে না এবং উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্নে মানুষ প্রতারণার শিকার হবে না।

আমরা এমন বাংলাদেশ চাই না, যেখানে কোনো বাবা সন্তানের কফিন বুকে জড়িয়ে কান্না করবেন, কিংবা কোনো মা বছরের পর বছর সন্তানের ফেরার অপেক্ষায় দরজা খোলা রাখবেন। আমরা চাই এমন একটি দেশ, যেখানে জীবিকার সন্ধান মানুষকে মৃত্যুর ফাঁদে ঠেলে দেবে না এবং উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্নে মানুষ প্রতারণার শিকার হবে না।

মনে রাখতে হবে, শর্টকাটের মোহ কখনো নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে না। সং পরিশ্রম, সঠিক তথ্য, সচেতনতা এবং আইনি পথে বিদেশগমনই নিরাপদ জীবনের ভিত্তি। আসুন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রতিটি নাগরিক মানব পাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই। আমাদের অঙ্গীকার হোক—কোনো স্বপ্ন আর যেন প্রতারণার শিকার না হয়, কোনো পরিবার আর যেন প্রিয়জন হারানোর বেদনা বয়ে না বেড়ায়। গড়ে উঠুক মানব পাচারমুক্ত, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও মানবিক এক বাংলাদেশ।

#

লেখক: সহকারী পরিচালক, ডিএফপি

পিআইডি ফিচার